বাংলা সিনেমার দর্শক ও ছিন্নমূল

মৃণাল সেন

বাংলা সিনেমা আজ এক চরম দুর্গতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তা ভরা পচা গল্পে, নায়ক নায়িকার ন্যাকামি-ঠাসা সংলাপে, দেশপ্রেমের উৎকট বুকনিতে আর হলিউডি ঢং-এ নারীদেহের কুৎসিত কসরতে সিনেমার আবহাওয়া আজ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিছু-দিন ধরে সিনেমার আসরে ভূতের আমদানি হতেও দেখা যাচ্ছে—অদ্ভুত অলৌকিক আজগুবি সব কাণ্ডকারখানা। সিনেমার কর্তারা চোলাইকরা সংস্কৃতি আজ দর্শকসমাজে বিলোচ্ছেন আর দিব্যি মুনাফার পাহাড় লুটছেন। সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কর্তারা সমানে সাফাই গেয়ে চলেছেন, 'আমরা ব্যবসা-দার, দর্শকদের চাহিদা মেনেই আমাদের চলতে হবে।' অর্থাৎ দর্শকের রুচিই ঐরকম; পয়সা দিয়ে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করতেই তাঁরা চান।

বাস্তব ঘটনা যাচাই করে দর্শক সম্বন্ধে ঐ ধরনের ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নতুন ছবি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এক অবিশ্বাস্য রকমের ভিড় যে প্রেক্ষাগৃহের সামনে ফেটে পড়ে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। টিকিট কাটার উত্তেজনায় প্রতীক্ষমান দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতেও প্রায় দেখা যায় এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে পুলিশও প্রায় তৎপর হয়ে ওঠে। এ সমস্ত বিচার করলে স্বভাবতই মনে হতে পারে, সিনেমার কর্তাদের উক্তি হয়তো ফেলে দেবার মতো নয়।

কিন্তু দর্শকের রুচির এই কি প্রকৃত রূপ? তা নয়, এবং তা আজ আমাদের চোখের সামনে ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সাধারণ দর্শকের উপর আস্থা হারানোর কোন কারণই যে ঘটেনি, রসগ্রহণের ক্ষমতা যে দর্শকের পুরোপুরি রয়েছে তার প্রমাণ বাংলা-দেশের নবনাট্য আন্দোলন। আজ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ভিত আজ যেভাবে নড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে সাধারণ দর্শকের রসগ্রাহিতা। কয়েক বছর আগে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' গোটা ভারতবর্ষের নাটকের ট্র্যাডিশনের শিকড় ধরে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল তা আজ নয়া-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। গণসংস্কৃতির এই অসীম সার্থকতা উঁচকপালে ইন্‌টেলেকচুয়ালদের কেতাবি বিচারের ওপর নির্ভরশীল থাকেনি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই সংস্কৃতির (যা হচ্ছে দুনিয়ার একমাত্র সংস্কৃতি) উৎস ও মূল্য বিচার চিরকাল যাঁরা করে এসেছেন ভবিষ্যতে তাঁরাই করবেন অর্থাৎ সাধারণ দর্শক,—এবং এই দর্শকদেরই রুচিবিকৃতি ঘটেছে বলে সমাজের ওপরওয়ালা অর্থাৎ আর্টের মনোপলিস্টরা আজ জঘন্য প্রচার চালাচ্ছেন।

আসলে দর্শকদের রুচিবিকৃতি ঘটে নি; ঘটানোর চেষ্টা চলছে। কুৎসিত সংস্কৃতিতে বাজার ছেয়ে ফেলে সমাজের ওপরওয়ালারা আজ দর্শকের মনে ব্যাধি আর নোংরামির সাইকোলজি তৈরি করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

'ছিন্নমূল'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই এই সমস্ত কথার অবতারণা করার বিশেষ কারণ আছে।

'ছিন্নমূল' বাজারে বেরোবার আগে ঘরোয়াভাবে কয়েকজন সিনেমা বিশেষজ্ঞকে ছবিটি দেখানো হয়। তাঁদের মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত পরিচালক পুডোভকিন ও ও অভিনেতা চেরকাশভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে পুডোভকিন। ছবির গুণাগুণ খুঁটিয়ে বিচার করেছেন তিনি। পরিচালককে তাঁর বাস্তবানুগ ভাবধারার চিত্র রূপায়ণের জন্যে পুডোভকিন তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জনিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'ভারতবর্ষে আমি যত ছবি দেখেছি সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ছিন্নমূল!' ভারতবর্ষের এক তরুণ পরিচালকের উদ্দেশে পুডোভকিনের এই প্রশংসাবাণী আজ নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতির ধারাকে সম্মানিত করেছে। শুধু ছিন্নমূলের পরিচালকই নন,—এ দেশের সিনেমাশিল্পী ও সিনেমারসিক সবাই এজন্যে গর্ব অনুভব করবেন। তাছাড়া ছোট-বড় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় 'ছিন্নমূল' সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে ছবির ইতিহাসে এ ধরনের সম্পাদকীয় মন্তব্য আর কখনও করা হয়নি। (একমাত্র '৪২ নামক ছবির সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিছু লেখা হয়েছিল, কিন্তু তা ছবির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে নয়। অন্যায়ভাবে ছবিটিকে সেন্সর বোর্ডের কর্তারা আটকে রাখায় সেখানে তারই তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এদিক। থেকেও 'ছিন্নমূল' এক বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে।)

স্বভাবতই 'ছিন্নমূল' সম্পর্কে সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন। এবং বাস্তবিকই আমাদের দেশের সিনেমায় 'ছিন্নমূল' এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এই ছবিতে হলিউডি ছাঁচে কুৎসিত রস বিতরণের কোন চেষ্টা নেই, চেষ্টা নেই কৌতুক রসের নামে ভাঁড়ামির আশ্রয় নেওয়া, চটকদারি ফাঁকা বুলি বা জটিল সমাজ সমস্যার ঠুনকো সমাধানের ঔদ্ধত্যও এই ছবিতে প্রকাশ পায়নি। কোন কোন সিনিক নায়কের অসহ্য ইনটেলেকচুয়ালিজম অথবা ধনীর দুলালীর মনধাঁধানো শ্রমিক দরদ এই ছবিতে নেই। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের এক দুর্যোগের ইতিহাস এই ছবির বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বেদনাময় অধ্যায় এই ছবির কাহিনী। কেমন করে একটা বিরাট ঝড় পূর্ববঙ্গের জীবনকে তছনছ করে দিয়ে দেশের শিরদাঁড়া দিয়েছিল ভেঙে, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি চিরকালের মত ছেড়ে নিরাশ্রয় বাস্তহারার দল কলকাতার ইঁটপাথরের রাস্তায় কিভাবে মাথা খুঁড়ে মরেছে, কিভাবে শিয়ালদা'র প্লাটফর্মের নোংরা পরিবেশে তারা রাতের পর রাত কাটিয়েছে, ক্ষিধের তাড়নায় তারা রাস্তায়-রাস্তায় ছুটে বেরিয়েছে কাজের আশায়—'ছিন্নমূল' সেই সব বুকভাঙা ঘটনারই জীবন্ত দলিল। সুতরাং 'ছিন্নমূল' যে এদেশের সিনেমায় এক বিরাট ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে তা বলা যেতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য, 'ছিন্নমূল' বাজারে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। দর্শক বলতে যাঁদের বুঝি, যাঁদের পয়সায় সিনেমা একটা বড়গোছের ব্যবসার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারছে, তাঁদের কাছে ছবিটি যথেষ্ট সমাদর পেল না।

প্রশ্ন ওঠে, কেন? যেখানে কাহিনীর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ, সুস্থ সবল আর্ট গড়ে ওঠার সমস্ত উপকরণই যেখানে বিদ্যমান সে ছবিটির এ অবস্থা কেন? তাছাড়া ব্যবসা হিসেবেও এই ছবি বাজারে আট-দশটা ছবির সঙ্গে নিশ্চয়ই এঁটে উঠতে পারছে না। সুতরাং, যে ভদ্রলোক এই ছবির পেছনে টাকা খাটিয়েছেন অথবা ভবিষ্যতে যাঁরা এই ধরনের ছবির জন্যে টাকা খাটাতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছেই বা আমরা কি জবাবদিহি করব?

কোন কোন শিল্পীবন্ধুকে বলতে শুনেছি, বাংলা সিনেমার দর্শক এই ধরনের বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে অক্ষম। তাঁদের মতে কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখতে দেখতে দর্শকদের রুচিই গেছে বিগড়ে; শিল্পের আসরে স্বাস্থ্য ও সবলতা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারছেন না।

এখানে একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখন ১৯৪১ সাল। যুদ্ধের প্রচণ্ড রিয়ালিটি হলিউডের স্বপ্নচূড়ায় আঘাত হানছে বার বার। বিশুদ্ধ আর্টের কল্পনায় মশগুল হয়ে যাঁরা নিতান্তই চিত্তবিনোদনের জন্যে ছবি তুলেছিলেন তাদের কোণঠাসা করে দিয়ে মাথা তুলে উঠছে রিয়ালিস্টিক আর্ট। নতুন বলিষ্ঠ ভাবধারা নিয়ে দেখা দিলেন শিল্পীর দল,—নিছক চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়, সিনেমার আর্টকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে। সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া, ব্যথা-বেদনা, নিপীড়িত, নির্যাতিত জনসাধারণের ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা—এরই মধ্যে রয়েছে আর্টের সার্থকতা, এই হচ্ছে শিল্পীর দায়িত্ব। হলিউডের চিন্তাস্রোত তখন এই দিকে বইছিল।

হলিউডের এই সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তে প্রেস্টন স্টার্জেস নামে এক চিত্র-পরিচালক এক ছবি তুললেন—সুলাই-ভান্‌স ট্রাভেলস। ছবির নায়ক হচ্ছেন হলিউডের এক পরিচালক। তিনি সিনেমার আর্টকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। মজুর এলাকায় গিয়ে মজুরের অভাব অভিযোগের কথা, তার শোষণের ইতিহাস ছবিতে রূপায়িত করলেন। কিন্তু দেখা গেল সমস্ত হাড়ভাঙা খাটুনির খাটার পর নিজেদের জীবনের দুঃখের প্যানপ্যানানি শুনতে বা দেখতে মজুরদের ভালো লাগে না। তার চাইতে ঢের ভালো লাগে ভাঁটিখানায় বসে হৈ-হুল্লোড় করতে। নায়ক পরিচালক তখন নতুন ছবি তুললেন—মজুরদেরই জন্যে। কুৎসিৎ নাচগান, সস্তা হৈ-হুল্লোড়ে ভরা ছবি। অদ্ভুত ভালো লাগল মজুরদের। মদের নেশায় আর ছবির কুশ্রীতায় মজুরদের সান্ধ্য বৈঠকগুলো সরগরম হয়ে উঠল। নায়ক তখন হলিউডে ফিরে এসে এই কথাই প্রচার করলেন যে বাস্তবধর্মী শিল্প নেহাৎ বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়। মজুরদের শিরদাঁড়া-ভাঙা, পোড়-খাওয়া জীবনে যে শিল্পী এতটুকু আনন্দের খোরাক জোটাবে সে ধন্য,—ধন্য তার শিল্প। অতএব মজুরের কল্যাণে, মজুরের বিষিয়ে ওঠা জীবনে সামান্যতম আনন্দ বিতরণের জন্যেও কাজে লাগাও, কুৎসিত নাচ-গানে, অশ্লীল ভাবধারায় সিনেমার বাজার মাতিয়ে রাখো।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, 'ছিন্নমূল' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি বলে যাঁরা দর্শকের বিচার-বুদ্ধির ওপর আঘাত করেছেন, জেনেশুনে অথবা অজান্তে তাঁরা কিন্তু সিনেমার কর্তাদেরই পক্ষেই ওকালতি করেছেন। তার ফল দাঁড়াবে এই যে, কোন ধুরন্ধর 'সিনেমা-বণিক হয়তো একদিন প্রেস্টন-স্টার্জেসের মতোই এক জঘন্য ছবি তুলতে এগিয়ে আসবেন।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ছিন্নমূল-এর দোষ কোথায়? বিষয়বস্তু যদি সত্যিই জীবনধর্মী হয়ে থাকে, রাজনৈতিক দাবাবড়ের চালে[1] পর্যুদস্ত বাস্তহারাদের জীবন কাহিনীতে যদি যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েই থাকে, তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে এই অঘটন কেন?

'ছিন্নমূল' নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবন—কামার, কুমোর, চাষী, ছুতোর—যা কিছুই একান্ত গ্রামীণ ও দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত তাই ফুটে উঠেছে ছবির কাহিনীতে। দারিদ্র্য রয়েছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন রয়েছে, কিন্তু সাধারণ বাংলা ছবির মতো দারিদ্র্যের রোমান্স নেই। এক-আধটা দুর্বল সংলাপ[2] ও ছোটখাট দু-একটা ঘটনা ছাড়া ন্যাকামির প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি কোথাও। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ছবি (image) জুড়ে বক্তব্যকে অদ্ভুত সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং বাংলা ছবিতে এই ধরনের ইমেজ সংযোজন এই প্রথম।

---

১. 'রাজনৈতিক দাবাবড়ের চালে' কথাটা ব্যবহার করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ছিন্নমূল ছবিতে এর কোন ইঙ্গিত নেই। অবশ্য ছবিতে দেশ-বিভাগের রাজনীতির যথাযথ রূপদানও সম্ভব হত না, কারণ কুখ্যাত সেন্সরবোর্ড এখনও বর্তমান। সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়াই একমাত্র পথ। কিন্তু 'ছিন্নমূলে' এড়িয়ে না গিয়ে দেশবিভাগ সম্পর্কে প্রশ্নটার মীমাংসা যেভাবে করা হয়েছে তা থেকে ভুল বোঝার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। পরিচালক ও কাহিনীকার এ বিষয়ে একটু যত্নবান হলে ভাল হত।

২. শ্রীকান্ত পূর্ববঙ্গের এক চাষী, তার মুখে—'ঝড় হয়, তাই বইলা কি পাখী বাসা বান্ধে না?' অত্যন্ত কৃত্রিম সিনেমা ঘেঁষা সংলাপ এইটি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্ষাকালের কথা বলতে গিয়ে পরিচালক দেখালেন একটা ব্যাঙ জলে লাফিয়ে পড়ল। সোজাসুজি পুলিশকে না দেখিয়ে দেখানো হল পুলিশের বুট দরজায় লাথি মারছে এবং একটু পরেই আবার দেখানো হল হাতকড়া নেমে আসছে। এমনি আরো টুকরো-টুকরো ইমেজ বাস্তবিকই পরিচালকের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য কতকগুলো ইমেজ, যেমন গর্ভবতী চাষী-বউটির পাখির বাসার দিকে তাকিয়ে থাকা, দেশের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়া, স্বপ্নের মধ্যে প্রদীপটিকে ঝড় থেকে আড়াল করে রাখা, পাখির বাসা হাওয়ায় নড়া—এ সব বেশ খানিকটা স্থূল হয়ে পড়েছে; বড় বেশি লিটারাল (literal) হয়ে পড়ায় এ সব মোটেই শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া পাখির বাসার অতি-প্রয়োগের ফলে মাঝে-মাঝে সহজ সরল গ্রাম্য পরিবেশটিকে অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হয়েছে, বক্তব্যের ডিগ্‌নিটি (dignity) যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে গর্ভবতী চাষী-বউর আম-কাসুন্দি খাওয়া ইত্যাদি ছোট ছোট অ্যাকশনে এবং সর্বশেষে সমস্ত হতাশার শেষে চাষী-বউর মৃত্যুর পরেই নবজীবনের জানানি হিসেবে নবজাতকের বলিষ্ঠ কান্না বক্তব্যকে অভাবনীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। শিয়ালদা স্টেশনের বাস্তহারাদের ডকুমেন্টারি ছবি দর্শকের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। বাস্তহারা বুড়ির ভূমিকায় বাস্তহারা ক্যাম্পের সত্যিকারের এক বৃদ্ধার এবং গ্রামের এক ব্রাহ্মণ মোড়লের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসুর অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া চাষী-বউর ভূমিকায় শোভা সেন ও পার্শ্বচরিত্রে জলদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অধিকাংশ বাংলা ছবির অভিনয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, ছবির কাহিনী থেকে শুরু করে ছোটখাট ইঙ্গিতপূর্ণ অ্যাকশন সবকিছু করা হয়েছে এদেশের সিনেমার ট্র্যাডিশনকে ডিঙিয়ে; এবং তা করতে গিয়ে পরিচালক যে সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

তা সত্ত্বেও 'ছিন্নমূল' দর্শকদের ভালো না লাগার কারণ আছে। এখানেই আসছে আঙ্গিকের প্রশ্ন,—কিভাবে, কেমন করে শিল্পী তাঁর বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলবেন। ছোটখাটো টুকরো বক্তব্য নয়, সামগ্রিকভাবে গল্পটিকে কেমন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করছে দর্শকের ভালোলাগা আর না লাগা। টুকরো-টুকরো ইঁট যেমন-তেমন জড়ো করে বাড়ি তোলা যায় না। বাড়ি তুলতে হলে ইঁটগুলো সাজানোর একটা পদ্ধতি আছে। পাথরের পর পাথর যেমন-তেমন বসিয়ে তাজমহল তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে সুদক্ষ শিল্পীর সুনিপুণ প্রয়োগ-কৌশলে। ঠিক তেমনি ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে ঘটনার মালা গেঁথে অথবা মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সুন্দর ইমেজ বা অর্থপূর্ণ অ্যাকশান জুড়ে কাহিনী বা ছবিকে রসগ্রাহী করে তোলা সম্ভব নয়। তা করতে হলে চাই শিল্পীর প্রয়োগ-চাতুর্য। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে নতুন ঘটনার উৎপত্তি, তার সঙ্গে ব্যক্তিচরিত্রের সংঘর্ষ, ফলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি—এমনি করেই চিত্রনাট্য তৈরি হয়। তারপর সিনেমার ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে চাই টুকরো টুকরো অজস্র ছবির সুনিপুণ সংযোজন। পুডোভকিন বলেছেন, 'A film is not shot, it is built'—সিনেমার আর্টের গোড়ার কথাই হচ্ছে ঐ।

কিন্তু 'ছিন্নমূল' সেদিক থেকে দর্শকদের হতাশ করেছে এবং তার জন্যে দায়ী মূলত চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যের গ্রন্থি প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছি, নাটকীয়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে পদে পদে। গতি অত্যন্ত মন্থর, ঘটনাও বেশ অসংলগ্ন কোন দৃশ্যে এক অদ্ভুত চমৎকারিত্ব বা নাটকীয়তার সৃষ্টি হতে চলেছে ঠিক এমনি সময়ে মাঝপথে হঠাৎ দর্শকের মনের প্রস্তুতিকে ভেঙে দিয়ে নতুন দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ফলে দর্শক ভালো লাগতে গিয়েও ভালো লাগল না, ছবির বক্তব্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জড়ানো হল না, দর্শক ছিটকে দূরে সরে এলেন। বারবার এরকম ঘটেছে। ঘটনাগুলো যথেষ্ট প্রাণস্পর্শী, যথেষ্ট বাস্তবানুগ হওয়া সত্ত্বেও চিত্রনাট্যে তার চিত্ররূপায়নের এই দুর্বলতার সঙ্গে ছবিটি সামগ্রিকভাবে জমে উঠতে পারল না।

প্রসঙ্গত একটা দৃষ্টান্ত ধরা যেতে পারে। ছবির প্রথমেই দেখানো হচ্ছে পদ্মার পারে জলডাঙা গ্রামের এক চাষী শ্রীকান্তকে, আর তারই সঙ্গে গ্রাম বাংলার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের—কামার, কুমোর, চাষী, ছুতোর, হিন্দু-মুসলমান সবাইকেই। পর পর কতকগুলো ছবি এবং সংলাপ স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটিই সুন্দর—গ্রামীণ চরিত্র, তার সহজ সরল প্রকৃতি, গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণমাতানো সম্প্রীতি—সব কিছুই ফুটে উঠছে আলাদা করে প্রতিটি ছবিতে বা শট-এ। কিন্তু চরিত্রগুলোর দুর্বল গাঁথুনির ফলে সমস্ত সিকোয়েন্সটাকেই মনে হল কেমন যেন আড়ষ্ট, কেমন যেন অসংলগ্ন, কৃত্রিম। রস একেবারেই জমল না। এমনি আরও অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে।

এদিক থেকে বাংলা দেশের অনেক ছবি সস্তা বিষয়বস্তু থাকা সত্ত্বেও শুধু ঘটনার নাটকীয় সংস্থাপনে দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে থাকে। 'ছিন্নমূল'-এ যেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ Characterisation of locale and period—সস্তা সিনেমার কর্তারা সে সব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না। মোটা মোটা ঘটনার নাটকীয় সমাবেশ করেই এঁরা খালাস; এবং তা এঁরা করতেও পারেন। কিন্তু আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ফুটিয়ে তোলা বাস্তবিকই দুরূহ ব্যাপার, এবং তার সার্থক রূপ দিতে গেলে আঙ্গিকের ওপর যথেষ্ট দখল থাকা চাই। 'ছিন্নমূল'-এর পরিচালক দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। ফলে অধিকাংশেই 'ছিন্নমূল' দর্শকের মন আকৃষ্ট করতে পারেনি।

ছবিটির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ যে আঙ্গিকের দুর্বল প্রয়োগে তা আরও খুঁটিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়ে। আগেই বলেছি শ্রীকান্তর বাড়ির দরজায় পুলিশের বুটের লাথি ও হাতকড়ি নেমে আসা—এ দু-টুকরো ছবির মধ্যে জুলুমবাজ পুলিশের চরিত্র রূপায়ণের বিরাট সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে এই দু-টুকরো ছবি পুলিশের চরিত্র চিত্রণের দুটো মূল্যবান উপকরণমাত্র, তার বেশি নয়। অর্থাৎ শুধু এই দুটো ছবি দিয়ে পুলিশ সম্পর্কে বক্তব্যটিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তা যথাযথ প্রকাশ করতে হলে চাই এই দুটো ছবির সঙ্গে আরো কিছু ছবির সুনিপুণ প্রয়োগ। অর্থাৎ পুডোভকিনের কথা—A film is not shot, it is built। আলোচ্য দৃশ্যটিতে আরও কয়েকটি ছবি অবশ্য ছিল, কিন্তু যেগুলোর সুষ্ঠু সংযোজনের অভাবে অর্থাৎ building-এর বক্তব্যটি দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। সস্তা সিনেমাওয়ালারা কিন্তু পুলিশের চরিত্রের রূপ দিতে গিয়ে এসবের ধার একেবারেই ধারতেন না। সেখানে হয়তো দেখানো হত মোটা জঘন্য চেহারার পুলিশ ঘরের ভেতর ঢুকে কাছে-পিঠে যা আছে লাথি মেরে ভেঙে ফেলেছে, (ঠাকুরের আসনটাও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া বিচিত্র নয়),—তারপর শ্রীকান্তকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে, সঙ্গে অকথ্য গালি-গালাজ, আর শ্রীকান্তর বউ আছড়ে পড়ে কাঁদছে। এই ধরনের দৃশ্য দর্শকের হৃদয়কে নিশ্চয়ই স্পর্শ করতে পারত। কিন্তু 'ছিন্নমূল'-এ যে স্টাইলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল তা সার্থক করে তুলতে পারলে নিঃসন্দেহে তা উন্নততর আর্ট হিসেবে গণ্য হত, এবং সেই স্বীকৃতি দর্শকের কাছ থেকে অবশ্যই পাওয়া যেত।

সবাই যখন গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে তখন ঘরের খুঁটি আঁকড়ে ধরে গ্রামের বৃদ্ধার সেই আকুলিবিকুলি সত্যিই মর্মস্পর্শী। বুড়িকে সবাই কত কিই না বোঝাচ্ছে, কেউ দেখাচ্ছে ভয়, কেউ গঙ্গাস্নানের লোভ দেখাচ্ছে, আরো কত কি! কিন্তু বুড়ির সেই এক কথা, 'তরা যা, আমি যামু না।' কথাগুলো দর্শকের

মনকে নাড়া দেয় প্রচণ্ড ভাবে। অথচ তার পরেই যখন বুড়িকে এবং সবাইকেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হল শহরের উদ্দেশ্যে সেখানে সব যেন কেমন মিইয়ে গেল। যেতে না-চাওয়া আর যেতে বাধ্য হওয়া—এর ভেতরকার সেই যে বিরাট ট্র্যাজিডি তা যেন কোথায় উবে গেল। বড় হাল্কা হয়ে গেল পরিবেশটি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির সেই কথা—হায়, 'তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়।' বিশ্বপ্রকৃতির কেউ কাউকে যেতে দিতে চায় না, আত্মীয়তা পাতানোর, জড়িয়ে থাকার সে কি ব্যাকুল আগ্রহ :

—ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে, 'যেতে নাহি দিব।'

বিশ্বচরাচরের সব কিছুই যেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলছে 'যেতে নাহি দিব'। হায় 'তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়।' যেন টুকরো টুকরো অনেক ছবির পরে দিগন্তজোড়া এক বুকভাঙা ছবি। কবির সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত ইমোশন উপচে উঠছে কবির ভাষায়, ছন্দে। ঠিক এমনি এক বিরাট অনুভূতি প্রস্তুত হচ্ছিল বুড়ির সেই নিষ্ফল কান্নার মধ্যে, বারবার সেই একই কথার ভেতরে 'আমি যামু না।' কিন্তু পরক্ষণেই আঙ্গিকের দুর্বল প্রয়োগের ফলে সেই অনুভূতি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পর্দার ওপর দর্শক দেখল শুধুমাত্র গুটিকয়েক বাস্তুহারা চলেছে শহরের উদ্দেশ্যে।

এমনি আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, বক্তব্যকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে হলে বলিষ্ঠ আঙ্গিকের প্রয়োজন। এবং 'ছিন্নমূল'-এ সেই আঙ্গিকেরই অভাব ঘটেছে।

আঙ্গিকের দুর্বলতা প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। তা হচ্ছে সম্পাদনার কাজ নিয়ে নিতান্তই ছেলেমানুষি করা। সম্পাদনা চলনসই হলে ছবিটি নিশ্চয়ই এতখানি প্রাণহীন হত না।

কোন কোন মহল থেকে এমনও শুনতে পেয়েছি যে 'ছিন্নমূল'-এর গল্পাংশ বড় কথা নয়, কারণ ছবিটি প্রধানত ডকুমেণ্টারি ধর্মী। সুতরাং সাধারণ ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যে যে ধরনের নাটকীয়তার প্রয়োজন হয়ে থাকে এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ডকুমেণ্টারি ছবিতে দৃশ্যবক্তব্যকে সাজিয়ে বলার দরকার নেই। ঠিক যেমনটি রয়েছে, ক্যামেরায় তেমনি তুলে নেওয়াই পরিচালকের কাজ। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। রিয়ালিটির হুবহু কপি ডকুমেণ্টারি ছবির ধর্ম মোটেই নয়। এই শ্রেণীর ছবিতে চিত্রপরিচালকের হাতে পড়ে রিয়ালিটি এক নতুন রূপ পেয়ে থাকে—নতুন এক রিয়ালিটির সৃষ্টি হয়, এবং তাকে filmic reality এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। Actuality-র কার্বন কপি করা নয়, তার নাট্যরূপ অর্থাৎ Dramatisation of actuality—ডকুমেণ্টারি ছবির সংজ্ঞাই হচ্ছে এই। ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসনের ছবি দেখে ডকুমেণ্টারি ছবির বিচার করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ একথা মনে রাখা দরকার যে ছবিকে প্রথমেই হতে হবে ছবি—তা সে ডকুমেণ্টারিই হোক বা অন্য যে কোন শ্রেণীর ছবিই হোক না কেন। অর্থাৎ আর্ট হিসাবে উতরিয়ে তুলতে পারলে তবেই তাকে বলব ছবি, তার আগে নয়। ফ্লাহার্টি, গ্রিয়ারসন, রোথা, ওয়াট, ভ্‌জিগা প্রমুখ শিল্পনায়করা আজ দুনিয়াজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন শুধু সেলুলয়েডে actuality-কে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে নয়, তার নিখুঁত dramatisation হয়েছে বলেই ছবিগুলো আজ আর্টের সম্মান পেয়েছে। 'ছিন্নমূল' বলিষ্ঠ বক্তব্যে বলীয়ান হয়েও সাজিয়ে না বলার দরুণ ছবিটি শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি বলেই তা দর্শক সমাজে সমাদর পাচ্ছে না।

'পরিচয়', ফাল্গুন, ১৩৫৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত